২

আইন ও নীতিগত সংস্কার

সারা হোসেন

বছরজুড়ে যেসব আইন ও নীতিমালা প্রণীত ও প্রস্তাবিত হয়েছে এই অধ্যায়ে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সেসব আইন ও নীতিমালার প্রভাব আলোচিত হয়েছে। বছরের শেষদিকে ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮ জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার আগ পর্যন্ত বিচার বিভাগের কাঠামোগত সংস্কার, দীর্ঘ প্রত্যাশিত তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ এবং অন্যদিকে উদ্বেগজনকভাবে সন্ত্রাসবাদের নামে কিছু কার্যাবলীকে নতুনভাবে অপরাধের আওতায় নেয়া হয়েছে। নীতিমালার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছিল নারী উন্নয়ন নীতি ও রূপান্তরযোগ্য জ্বালানিশক্তি বিষয়ক নীতিমালা।[১] প্রস্তাবিত বা খসড়া আইন যেগুলো বছর শেষেও প্রণীত হয়নি তার মধ্যে অন্যতম ছিল নারী নির্যাতনবিরোধী (গৃহ নির্যাতন ও যৌন হয়রানি) এবং পুলিশের সংস্কার বিষয়ক আইন।

সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮

১১ জুন ২০০৮ তারিখে জারি হওয়া এই অধ্যাদেশে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য, অখণ্ডতা বা নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয় বা জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে বা দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন যে কোনো কাজ অন্তর্ভুক্ত

১ রিনিউঅ্যাবল এনার্জি পলিসি অব বাংলাদেশ, www.powerdivision.gov.bd

হয়েছে।[২] সন্ত্রাসবাদী কাজের মধ্যে রয়েছে খুন, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ, সম্পদের ক্ষতিসাধন এবং বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থ, আগ্নেয়াস্ত্র বা কোনো ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দখলে রাখা বা ব্যবহার করা।[৩] জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা দেয়াকেও এই আইনে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার শাস্তি সর্বনিম্ন তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ বিশ বছর কারাদণ্ড এবং সেই সাথে অর্থদণ্ড।[৪] কোনো জঙ্গিকে আশ্রয়দান সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়।[৫] কেউ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের তথ্য সংবলিত প্রকাশনা বহন করলে বা এর পক্ষে প্রচার করলে তার সর্বনিম্ন দুই বছর থেকে সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সেই সাথে অর্থদণ্ড হতে পারে। আতঙ্ক সৃষ্টি বা দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ড বা তাতে অর্থায়নের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।[৬]

জনমত গ্রহণের কোনো উদ্যোগ ছাড়াই মৃত্যুদণ্ডসহ কঠোর শাস্তির বিধান সংবলিত এবং সরকারকে গ্রেফতার ও আটকের ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ায় আসক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর আমলে প্রণীত একইধরনের আইনের অভিজ্ঞতা থেকে আসক আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, অধ্যাদেশটি যত না সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হবে, তার চেয়ে বেশি প্রয়োগ হতে পারে বিরুদ্ধ মতকে শায়েস্তা করতে।[৭] 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে'র মধ্যে যে নতুন অপরাধগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার অধিকাংশই বিদ্যমান ফৌজদারি আইনে বিচার্য।[৮]

আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ ২০০৮

এই অধ্যাদেশ জারি করা হয় ২৫ মে ২০০৮। ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনের স্থলে অধ্যাদেশটি প্রতিস্থাপিত হয়। কোনো ইচ্ছাকৃত কাজ, উক্তি বা বক্তব্য যদি কোনো আদালতের দেয়া রায়, ডিক্রি, আদেশ,

---

২ সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮, ধারা ২।
৩ *প্রাগুক্ত*, ধারা ৬।
৪ *প্রাগুক্ত*, ধারা ৭।
৫ *প্রাগুক্ত*, ধারা ১৪।
৬ *প্রাগুক্ত*, ধারা ১২।
৭ 'উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদন পেল সন্ত্রাসবাদবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮', *আসক-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি*, ২০ মে ২০০৮।
৮ 'লিগ্যাল এক্সপার্ট ওপোজ অ্যানটি টেরর অর্ডিন্যান্স', www.bangladeshnews.com.bd, ১৬ জুন ২০০৮। (আইনজ্ঞ ও মানবাধিকার কর্মী ড. শাহদীন মালিক বলেন, বিদ্যমান আইনেই অপরাধগুলোর বিচার সম্ভব ছিল, নতুন আইনের কোনো প্রয়োজন ছিল না)।

রিট বা পরোয়ানাকে লঙ্ঘন করে যা বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তা অবমাননা হিসেবে বিবেচিত হবে। বিচারে বাধা সৃষ্টিও অবমাননা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৯] তবে কোনো আদালতের স্বাভাবিক বিচার বা কার্যক্রমের ওপর সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করা বা কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সদবিশ্বাসে এবং পরিমিত ভাষায় করা হবে। কোনো বিচারকের দুর্নীতি বা অদক্ষতার বিষয়ে এবং বিচারিক এখতিয়ারের বাইরে তাদের বিচার-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাবে এবং কোনো রায়ের গঠনমূলক সমালোচনা করা যাবে।[১০] যে কোনো 'আদালত অবমাননা'র বিচার দুই বছরের মধ্যে এবং যেক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে সেক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে এই বিচার সম্পন্ন করতে হবে। আদালত অবমাননার শাস্তি সর্বোচ্চ ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে।[১১]

হাইকোর্ট এই অধ্যাদেশটি অবৈধ ঘোষণা করে এবং অধ্যাদেশটি সংবিধানের চেতনা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খাটো করেছে বলে মত প্রকাশ করে।[১২] সংবিধানের ৫৮ (ঘ) অনুচ্ছেদের[১৩] উল্লেখ করে আদালত বলে যে, বিদ্যমান একটি আইনকে বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়ন করা একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং যেহেতু নির্বাচনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই তাই এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত কর্তৃত্ব-বহির্ভূত। আদালত আরও বলেন যে, অধ্যাদেশটি ১০(১) ধারায় সরকারি চাকরিজীবীদের আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে সশরীরে আদালতে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছে যা 'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান'– এই নীতির লঙ্ঘন।[১৪]

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৮

---

৯ ধারা ২, আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ ২০০৮।

১০ ধারা ৩, *প্রাগুক্ত*।

১১ ধারা ৫, *প্রাগুক্ত*।

১২ আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ ২০০৮-এর কতিপয় বিধানকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট পিটিশনে আদালতের রুলিং, বিচারপতি এবিএম খায়রুল এবং বিচারপতি মো. আবু তারিকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আরও উল্লেখ করেন যে অধ্যাদেশটি সুপ্রিম কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেসিকে সংকুচিত করেছে।

১৩ সংবিধানের ৫৮(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং নির্বাচন আয়োজন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে। প্রয়োজন ছাড়া কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবে না।

১৪ জহুরুল আলম, 'বাংলাদেশ এইচসি ডিক্লেয়ারস্ কনটেম্পট অব কোর্ট অর্ডিন্যান্স ইনভ্যালিড', www.news.voa.com, ২৪ জুলাই ২০০৮।

অধ্যাদেশটি জারি হয় ১৬ জুন ২০০৮। এই অধ্যাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দেয়ার জন্য নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। এই কমিশনের নেতৃত্ব দেবেন প্রধান বিচারপতি এবং এতে আরও থাকবেন আইনমন্ত্রী, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দু'জন বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দু'জন বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।[১৫]

প্রাথমিকভাবে আইন মন্ত্রণালয় প্রতিটি শূন্য পদের জন্য পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করবে এবং কমিশন প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে সর্বোচ্চ দুটি করে নাম চয়ন করবে। কমিশন আইন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত নামগুলোর বাইরে অন্যদের নামও বিবেচনায় আনতে পারে[১৬] এবং তারপর এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; আর তা না হলে সংখ্যাধিক্যের ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে।[১৭]

রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ দেবেন এবং চাইলে তিনি কোনো সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনে ফেরত পাঠাতে পারেন। এক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে অথবা আগের সুপারিশই আবার পাঠিয়ে দিতে পারে। যদি রাষ্ট্রপতি কোনো সুপারিশের ভিত্তিতে কাজ না করেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে হবে।[১৮]

অধ্যাদেশটির ওপর সংবাদমাধ্যম এবং আইনজ্ঞদের সমালোচনায় যেদিকটি গুরুত্ব পেয়েছে তা হচ্ছে নির্বাহী বিভাগকে বিচার বিভাগের ওপর প্রাধান্য দিয়ে, বিশেষ করে আইন মন্ত্রণালয়কে প্রাথমিক সুপারিশ তৈরির ক্ষমতা দিয়ে অধ্যাদেশটি এর মূল চেতনাকেই খর্ব করেছে।[১৯] নির্বাহী বিভাগকে যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা মোটেও ভারসাম্যপূর্ণ নয়, কমিশনের নয়জন সদস্যের মধ্যে বলতে গেলে প্রায় চারজনই নির্বাহী বিভাগের; আইনমন্ত্রী, আইন সচিব, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সরকারদলীয় একজন সংসদ সদস্য। এই ভারসাম্যহীনতা আরও প্রকট হয়েছে এ কারণে যে, মাত্র পাঁচজন সদস্য (প্রধান বিচারপতিসহ) উপস্থিত থাকলেই এর

---

১৫ ধারা ৩, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৮।

১৬ ধারা ৬, *প্রাগুক্ত*।

১৭ ধারা ৪(৭), *প্রাগুক্ত*।

১৮ ধারা ৯, *প্রাগুক্ত*।

১৯ এম জসিম আলী চৌধুরী, 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন নিডস্ রিএডজাস্টমেন্ট', *দি ডেইলি স্টার,* ১০ মে ২০০৮।

কোরাম পূর্ণ হবে। আইন সচিবের সদস্যপদ এ ধরনের পদে নজিরবিহীন এবং এক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা 'ক্ষমতার বিভাজনে'র তত্ত্বের পরিপন্থী।[২০] কোনো কোনো সমালোচক এমনও আশঙ্কা করেছেন যে, আইন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ আপিল বিভাগে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিচারপতি নিয়োগের প্রথাকেও ভঙ্গ করতে পারে।[২১]

নতুন এই বিধানগুলো বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো মানদণ্ড নির্ধারণ করেনি। তাই যদিও রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশ পুরোপুরিই উপেক্ষা করতে পারেন এবং যদিও তিনি এর কারণ কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন, এই কারণগুলো প্রকাশ করার কোনো প্রত্যক্ষ বিধান অধ্যাদেশটিতে না থাকায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনস্বার্থের অজুহাতে এই কারণগুলো জনগণের অগোচরেই থেকে যাবে।

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮

এই অধ্যাদেশ জারি হয় ২০ অক্টোবর ২০০৮। জনগণের ক্ষমতায়ন এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ্য।

এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী যে কোনো নাগরিক সরকার বা জনগণের অর্থে পরিচালিত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য চাইতে পারেন এবং আবেদনের ২০ দিনের মধ্যে তিনি তা পাবেন। এতে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তথ্য কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে। আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি কমিশনের প্রতিটি পদের বিপরীতে তিনটি করে নাম প্রস্তাব করবেন যার মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। কোনো ব্যক্তি তথ্য না পেলে বা ভুল তথ্য পেলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এবং পরে তথ্য কমিশনে আবেদন করতে পারেন। তথ্য প্রদানে ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য প্রদানের শাস্তি ২৫,০০০ টাকা এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা।

সরকারের খসড়া প্রস্তুতি কমিটি প্রথমে 'জনস্বার্থ' ও 'রাষ্ট্রীয় মর্যাদা'র প্রশ্নে তথ্যের অবমুক্তি বারিত করার বিধান রেখেছিল। পরবর্তীকালে নাগরিকদের সমালোচনার মুখে এগুলো বাদ দেয়া হয়। যদিও চূড়ান্ত পর্যায়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়। আটটি প্রধান গোয়েন্দা

---

২০ মিজানুর রহমান খান, 'বিচারপতি নিয়োগে আইন মন্ত্রণালয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা', *প্রথম আলো,* ২৪ মার্চ ২০০৮; শাহদীন মালিক, 'বিচারপতি নিয়োগের উদ্ভট অধ্যাদেশ', *প্রথম আলো,* ২৬ মার্চ ২০০৮।

২১ ধারা ৬ (১) ও (২), সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৮।

সংস্থাসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।[২২]

জনপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮

এই অধ্যাদেশটি জারি হয় ১৯ আগস্ট ২০০৮। সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতার জন্য নতুন কিছু অযোগ্যতা নির্ধারণ করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করে এই অধ্যাদেশ। নতুন করে আরোপিত বিধিনিষেধ যে কোনো সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী,[২৩] জনপ্রশাসন, সামরিক বাহিনী বা সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সামরিক প্রশাসনের কোনো সাবেক সদস্য, অথবা বেসরকারি সংস্থার সাবেক প্রধানের (তাদের পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণের তিন বছর পর্যন্ত)[২৪] ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (এরকম কোনো ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাও হতে পারবেন না)।[২৫] এ বিধিনিষেধ ঋণখেলাপি ও বিভিন্ন পরিসেবার বিলখেলাপিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[২৬] অবশ্য নৈতিক স্খলন ঘটিত অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে এ বিধিনিষেধের আওতায় আনার পরিকল্পনা থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তির মুখে (উভয় রাজনৈতিক শিবিরেই চূড়ান্ত মনোনয়ন পাওয়ার জন্য এমন অনেক প্রার্থী ছিলেন, যারা এ ধরনের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু আপিল বিবেচনাধীন অবস্থায় জামিন পেয়েছেন) সাজাপ্রাপ্ত শেষ পর্যন্ত তা আর রাখা হয়নি। এছাড়া দলগুলোর গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সব কমিটিতে ৩৩ শতাংশ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা ও ২০২০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সর্বোপরি দলগুলোকে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা ছাত্রদের নিয়ে বা কোনো আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার চাকরিজীবী বা শ্রমিক বা অন্য কোনো পেশাজীবীদের নিয়ে কোনো অঙ্গ সংগঠন বা সহযোগী সংগঠন গঠনে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

অধ্যাদেশে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য কিছু অযোগ্যতাও নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি কোনো রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য সংবিধান পরিপন্থী হয় কিংবা এতে যদি ধর্ম, জাতিসত্তা, বর্ণ, ভাষা বা লিঙ্গের ভিত্তিতে

২২ 'রাইট টু ইনফরমেশন অর্ডিন্যান্স ওকেড', *দি ডেইলি স্টার*, ১৯ জুন ২০০৮ আরও দেখুন : www.bangladeshnews.com.bd, ১৯ জুন ২০০৮।

২৩ অনুচ্ছেদ ১২ (ক), জনপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮।

২৪ *প্রাগুক্ত।*

২৫ *প্রাগুক্ত।*

২৬ *প্রাগুক্ত।*

বৈষম্যমূলক কিছু থাকে তাহলে ঐ রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কোনো রাজনৈতিক দল যদি পরপর দু'বার সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে অথবা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় তাহলে সে দলের নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।[২৭]

নির্বাচনী আইনের গুরুতর লঙ্ঘন বা অসদাচরণের জন্য কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছে নির্বাচন কমিশন (রাজনৈতিক দলগুলোর চাপে এই ক্ষমতা আগে প্রত্যাহার করা হয়েছিল)।[২৮] এই প্রথমবারের মতো সংসদ নির্বাচনে 'না ভোট' দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। যদি কোনো নির্বাচনী আসনে ৫০ শতাংশের বেশি 'না ভোট' পড়ে তাহলে ঐ আসনের নির্বাচন বাতিল হবে এবং উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮

অধ্যাদেশটি জারি হয় ৮ মে ২০০৮। এর মাধ্যমে বন্দরে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। অধ্যাদেশটি ডক ওয়ার্কার্স ম্যানেজমেন্ট বোর্ডকে অবলুপ্ত করেছে আর বোর্ডের কর্মীদের বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিয়ে এসেছে। বন্দরের ২০০ মিটারের মধ্যে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের কার্যালয় স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে[২৯] এবং বন্দর কল্যাণ তহবিলে যে কোনো দানের ৫০ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে।[৩০] শ্রম আইন লঙ্ঘনের শাস্তি বাড়িয়ে তিন মাসের কারাদণ্ড এবং ২৫,০০০ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে (আগে এর পরিমাণ ১০,০০০ টাকা ছিল)।

অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ ২০০৮

এটি জারি হয় ১৮ মে ২০০৮। রাষ্ট্রের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য একটি অ্যাটর্নি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে এই অধ্যাদেশ।[৩১] সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এই অধিদপ্তর সুপ্রিম কোর্টের জন্য ১৯৭ জন আইন কর্মকর্তা (অ্যাটর্নি) এবং নিম্ন আদালতের জন্য আরও ১,৭৯৯ জনকে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব করে। হাইকোর্ট বিভাগ ২৯ জুলাই এই অধ্যাদেশ এবং এর অধীনে যে

---

২৭ অনুচ্ছেদ ৯০ (ছ), *প্রাগুক্ত*।

২৮ অনুচ্ছেদ ৯১ (ঙ), *প্রাগুক্ত*।

২৯ ধারা ২, বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮।

৩০ 'গভ. টু এলাউ লিমিটেড স্কেল ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাকটিভিটিজ', www.bangladeshnews.com.bd, ৭ মে ২০০৮।

৩১ ধারা ৩, অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ ২০০৮।

কোনো নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আব্দুল মান্নান খান, চঞ্চল কুমার দত্ত ও খন্দকার আঞ্জুমান আরা শেলীর জনস্বার্থে দায়ের করা রিট মামলায় আদালত কেন এই অধ্যাদেশকে আইন-বহির্ভূত এবং বাতিল ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে বলে।[৩২]

উপদেষ্টা পরিষদ ২০ নভেম্বর এই অধ্যাদেশটির সংশোধন অনুমোদন করে যাতে এই অধ্যাদেশটি শুধু নিম্ন আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। জেলা পর্যায়ে জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা হবে জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি, যুগ্ম অ্যাটর্নি এবং সহকারী অ্যাটর্নি সমন্বয়ে।[৩৩] অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের আইনজীবীরা পূর্ববর্তী প্রথা অনুযায়ী নিযুক্ত হবেন এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে আসবেন না।

মানি লন্ডারিংবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮

এই অধ্যাদেশ জারি হয় ১৫ এপ্রিল ২০০৮। অধ্যাদেশটি তদন্ত ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য অন্য দেশের সরকার বা কোনো সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক, চুক্তি বা সনদের মাধ্যমে অন্যান্য দেশ বা সংস্থার সাহায্য নেয়ার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংককে দিয়েছে।[৩৪] মানি লন্ডারিংয়ের সাথে যুক্ত অপরাধ তদন্তে এবং এধরনের অর্থ জব্দ করতে সরকারকে যে কোনো দেশের সরকারের সাহায্য চাওয়ার এবং যে কোনো তদন্তকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অধ্যাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংককে কোনো কুরিয়ার সার্ভিস, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা, এনজিও এবং শেয়ার ও সিকিউরিটি ব্রোকারদের জরিমানা করার ক্ষমতা দিয়েছে, যদি এরা অধ্যাদেশের বিধিমালায় বর্ণিত ১৭ ধরনের অপরাধের কোনো একটি করে।[৩৫] এ অপরাধগুলোর মধ্যে আছে দুর্নীতি ও ঘুষ, মুদ্রা বা কাগজপত্র জাল করা, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, অবৈধ অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা, চোরাচালান, মুক্তিপণের জন্য অপহরণ, খুন, যৌন হয়রানি, স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা পাচার এবং মানুষ পাচার।[৩৬]

---

৩২ 'অ্যাটর্নি সার্ভিসেস অর্ডিন্যান্স স্টেড', *নিউ এজ*, ৩০ জুলাই ২০০৮।

৩৩ 'ক্যাবিনেট ওকেস্ টু অর্ডিন্যান্স', *নিউ এজ*, ২১ নভেম্বর ২০০৮।

৩৪ ধারা ২৬, মানি লন্ডারিংবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮।

৩৫ ধারা ২৩, *প্রাগুক্ত*।

৩৬ আসফাক ওয়ারেস খান, 'কনটেম্পট অব কোর্ট অর্ডিন্যান্স ওকেড', *দি ডেইলি স্টার*, ৩ মার্চ ২০০৮; 'কনটেম্পট অর্ডিন্যান্স অ্যাপ্রুভড ইন প্রিন্সিপ্যাল', *নিউ এজ*, ৩ মার্চ ২০০৮।

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮

অধ্যাদেশটি জারি হয় ২৫ নভেম্বর ২০০৮। যারা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন তারা উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।[৩৭] এর আগে জুন মাসে এই আইনের আরেকটি সংশোধনী উপজেলা নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিষিদ্ধ করেছে। নতুন সংশোধনী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য প্রার্থিতা বাতিল করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দিয়েছে।[৩৮]

নাগরিকত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮

এই অধ্যাদেশ নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১-এর ধারা ৪ ও ৫-এ সংশোধন এনেছে, যার ফলে বাংলাদেশি কোনো মহিলার স্বামী নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং জন্মসূত্রে মা ও বাবা উভয়ের কাছ থেকেই নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে। আগের বৈষম্যমূলক বিধান অনুযায়ী একজন নারীর সূত্রে তার স্বামী বা সন্তান নাগরিকত্ব পেতেন না। এর মাধ্যমে তার অবসান হলো।[৩৯]

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮

অধ্যাদেশটি জারি হয় ৭ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে। আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২-এর ১(২) ধারায় বর্ণিত শাস্তির মেয়াদ ছয় বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছরে উন্নীত করে।[৪০]

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০০৮

অধ্যাদেশটি জারি হয় ১৩ অক্টোবর ২০০৮।[৪১] বিক্রয় পণ্যের নির্ধারিত মূল্য তালিকা প্রদর্শনে ব্যর্থতা,[৪২] নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য চাওয়া,[৪৩]

---

৩৭ ধারা ৩, স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮।

৩৮ 'জেএস পোল রানার বারড্ ফ্রম কনটেসটিং উপজেলা রেস', íìí.নিধহমষধফবংযহবং.পড়স.নফ, ২ ডিসেম্বর ২০০৮।

৩৯ 'সিজি অ্যাসাইনস্ কাউন্সিল কমিটি টু রিজলভ্ড ২৭ বিসিএস ক্রাইসিস', *দি ইনডিপেনডেন্ট* (ইন্টারনেট এডিশন আর্কাইভ)।

৪০ ধারা ২, আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮।

৪১ ২০০৮ সালের ৩৯ নং অধ্যাদেশ।

৪২ ধারা ৩৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০০৮।

৪৩ *প্রাগুক্ত,* ধারা ৪০।

ওজনে তারতম্য সৃষ্টি,[৪৪] ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভোক্তাকে বিভ্রান্ত করা[৪৫] ইত্যাদি এ অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধগুলোর অন্যতম। অধ্যাদেশের কোনো বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা ২,০০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড হতে পারে।[৪৬]

প্রস্তাবিত আইন

খসড়া পুলিশ আইন

পুলিশের জবাবদিহিতা ও সেবার মান বৃদ্ধি করতে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের পরিবর্তে নতুন পুলিশ আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে[৪৭] এবং সরকারের ওয়েবসাইটে তা দেয়া হয়েছে জনসাধারণের মন্তব্যের জন্য, যা নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।[৪৮]

খসড়া অধ্যাদেশটির দ্বিতীয় অংশে সাধারণ জনগণের প্রতি পুলিশের কর্তব্য, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নশীল হওয়া, কোনো অবস্থাতেই যেন কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত না হয় এবং নিরাপত্তার বোধ যেন মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে কাজ করে তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।[৪৯] খসড়া আইনে ধর্মের স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার রক্ষার বিধান রাখা হয়েছে।[৫০]

তৃতীয় অংশে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের অধীনে অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত করার জন্য একটি বডি বা কমিটি গঠিত হবে।

পুলিশের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য এই খসড়া আইনে কিছু নেই। যারা প্রস্তাবিত আইনটির ওপর মন্তব্য করেছেন তারা পুলিশ প্রশাসনে ওপর থেকে নিচে কর্তৃত্বের স্তরবিন্যাস এবং সদর দপ্তরের বাইরে যেসব পুলিশ সদস্য কাজ করেন তাদের ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিবরণ থাকা আবশ্যিক বলে মনে করেন। এই খসড়ার ওপর বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের মতামত সংগ্রহ এবং সেগুলোকে পুলিশ প্রশাসনের সংস্কারে কাজে লাগানো

---

৪৪ *প্রাগুক্ত,* ধারা ৪৬।

৪৫ *প্রাগুক্ত,* ধারা ৪৪।

৪৬ *প্রাগুক্ত,* অধ্যায় ৬।

৪৭ 'ড্রাফট অব পুলিশ অর্ডিন্যান্স ২০০৭ প্রিপেয়ার্ড', *নিউ এজ,* ১০ এপ্রিল ২০০৮।

৪৮ 'গভ. ইনভাইটস্ পাবলিক ভিউ ইন ড্রাফট পুলিশ অর্ডিন্যান্স', www.bdnews24.com, ২ ডিসেম্বর ২০০৮।

৪৯ ধারা ৩, খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭।

৫০ *প্রাগুক্ত,* ধারা ৪।

এখনো বাকি।[৫১] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ উদ্দেশ্যে একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়; কিন্তু বছরের শেষ পর্যন্ত খসড়াটি পুনর্বিবেচনা করার আর কোনো উদ্যোগই নেয়া হয়নি।[৫২]

গৃহ নির্যাতন (প্রতিরোধ ও দমন) বিল

চল্লিশটি মানবাধিকার ও নারী সংগঠনের একটি জোট জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত এ বিলটি ৩০ জুন নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টার কাছে পেশ করে। ২০০৫ সালে আইন কমিশনের একটি খসড়া বিল তৈরির প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করে এ কাজ সম্পন্ন হয়। এই বিলে গৃহ নির্যাতনের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে এবং গৃহ নির্যাতনের শিকার যে কোনো নারীর জন্য দেওয়ানি প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে খসড়া বিলটির কাজ এগিয়ে নিতে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি (বিস্তারিত নারী অধিকার অধ্যায়ে দেখুন)।

নীতিমালা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ঘোষণা করেন। বর্তমান নীতিতে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি (চার মাস থেকে পাঁচ মাস) করা এবং বিদেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, জাতীয় সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত আসনে স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

২০০৮-এ ঘোষিত এই নীতিকে মুসলিম ওলেমাদের একাংশ অনৈসলামিক ঘোষণা করেন। বিশেষ করে, তাঁরা উত্তরাধিকার আইনের সম্ভাব্য পরিবর্তন, অর্থাৎ সম্পত্তিতে নারীরা পুরুষের সমান উত্তরাধিকার পাবে– এই প্রশ্নে আপত্তি জানান। প্রকৃতপক্ষে নতুন নীতিতে (১৯৯৭ সালের নীতিতে যা ছিল) এ ধরনের কোনো বিধান নেই। ১১ মার্চে সরকার ঘোষণা করে যে ইসলাম বিরোধী কোনো আইন সরকার পাস করবে না।[৫৩] ২৭ মার্চে সরকার এই নীতিতে ইসলামিক বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করার জন্য ২০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে এবং ১৭ এপ্রিল কমিটি সরকারকে ঘোষিত নীতি থেকে নারী-

---

৫১ 'ড্রাফট পুলিশ অর্ডিন্যান্স', *দি ডেইলি স্টার*, ১৪ আগস্ট ২০০৭।

৫২ 'ওয়েবসাইট লঞ্চড্ টু ইলিসিট পাবলিক ওপিনিয়ন', *দি ডেইলি স্টার*, ৩ ডিসেম্বর ২০০৮।

৫৩ জ্যোতি রহমান, 'লেসন ফ্রম দি ওম্যান ডেভেলপমেন্ট পলিসি ডিবেকল', ফোরাম, ভলিউম ৩, সংখ্যা ৬, www.thedailystar.net|

পুরুষের সমতার অঙ্গীকার বাদ দিয়ে নারীর ‘ন্যায্য অধিকার’ অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে।[৫৪]

নির্দেশনা

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানিবিরোধী নীতিমালা

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও যৌন হয়রানির শাস্তির জন্য নীতিমালা প্রণয়নকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একটি কমিটি গঠন করে। এই নীতিমালা ৭ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার কথা।[৫৫] খসড়া নীতিমালায় যৌন হয়রানির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোনো অভিযোগ বিবেচনার জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যৌন হয়রানির ধরন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারণায় সম্পৃক্ত থাকার বিধানও এতে আছে। নীতিমালাটি কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য কর্মস্থলেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতি সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের অভিযোগ ওঠায় যৌন হয়রানিবিরোধী একটি নীতিমালার প্রয়োজন সামনে চলে আসে (নারী অধিকারের অধ্যায় দেখুন)।

অনুবাদ : তাপস বন্ধু দাস

---

৫৪ *প্রাগুক্ত।*

৫৫ ‘সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট রুলস ড্রাফট’, www.bdnews24.com, ৩ ডিসেম্বর ২০০৮।